f¨vU mšÍvm

ভ্যাট যারা আদায় করবে তারা যে দুর্নীতিবাজ সে কথা আমরা সবাই জানি। জানেন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানও। তারপরও তাদের দেয়া হয়েছে গ্রেপ্তার করতে পারার মতো বিশাল ক্ষমতা। আন্দোলনে নেমেছেন ব্যবসায়ীরা। ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পরিবেশ। মাস্তান আর পুলিশি সন্ত্রাসের পর জনগণ আক্রান্ত হতে যাচ্ছেন আরেক সন্ত্রাসে... লিখেছেন

আসজাদুল কিবরিয়া

'ভরপেট নাও খাই, রাজকর দেয়া চাই'- হীরক রাজার দেশের অন্যতম এই রাজবচন মগজ ধোলাই করে জনগণের মননে-মগজে গেঁথে দেয়া হতো। উদ্দেশ্য, যখন-তখন মন্ত্রের মতো এই বচন জপ করবে লোকজন আর শুধুই ভাববে কিভাবে রাজকর দেয়া যায়। তাহলে আর রাজকর আদায়ে পাইক-পেয়াদা পাঠাতে হবে না। রূপকথার সেই হীরক রাজার মতো অবস্থা বাস্তবে কোনোখানে নেই বটে, তবে কর বা ট্যাক্স আদায়ের উদ্যোগ ঠিকই আছে, সেটা বাংলাদেশেই হোক বা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই হোক। সেই সঙ্গে অনেক দেশেই আছে কর আদায়কারী সংস্থার লোকজনের দুর্দান্ত ক্ষমতা। প্রতিবেশী ভারত বা শ্রীলঙ্কায় কর প্রশাসনের ক্ষমতা এতখানি যে, তারা প্রয়োজনে বা সন্দেহ হলে করখেলাপি গ্রেপ্তার পর্যন্ত করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমানও এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে পিছিয়ে রাখতে চান না। কিন্তু কাজ করলেন এনবিআরের বুদ্ধি অনুসারে উল্টোটা। আয়কর দাতারা কর ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছেন, কর রেয়াত নিচ্ছেন আর গ্রেপ্তার করা যাবে ছোট দোকানদারদের ভ্যাটের জন্য! গত ১০ জুন বাজেটে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ভ্যাট বিভাগের সহকারী কমিশনারদের ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগে ব্যবসায়ীদেরকে গ্রেপ্তার করার এ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ব্যবসা করব, মুনাফা করব কিন্তু কর-ভ্যাট দেব না- এমন নীতি

আমরাও সমর্থন করি না। ট্যাক্স কালচার গড়তে হবেই। তাই বলে ভ্যাট আদায়ের নামে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। সহকারী কমিশনারের অদক্ষতা, অসততায় এই ক্ষমতা তাকে করে তুলবে নতুন সন্ত্রাসী। আয় বাড়বে না।

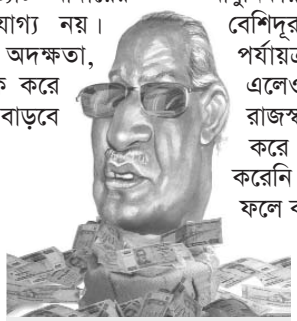

ছোট হোক, বড় হোক সব ব্যবসায়ীকে এখন ব্যবসা করতে হলে চাঁদা দিতে হয় দুই ধরনের সন্ত্রাসীকে। একটি হলো মাস্তান-চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী, আরেকটি হলো আইনের পোশাক পরিহিতি পুলিশরূপী সন্ত্রাসী

২.

সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানোর উদ্যোগ হিসেবে ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে সাইফুর রহমানই প্রথম ভ্যাট প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেন। মজার বিষয় হলো, পরবর্তীকালে অবসর গ্রহণকারী একাধিক আমলা বলেছেন, সাইফুর সাহেব প্রথমে ভ্যাট চালু করতে চাননি, বরং তাঁরাই অর্থমন্ত্রীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এটি চালু করিয়েছিলেন। ঘটনা যাই হোক, ভ্যাট প্রথা চালু করার ফলে সরকারের মোট রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। তবে একই সঙ্গে সমালোচনাও হয়েছিল ভ্যাটের ব্যাপারে। বিশেষ করে প্রথম দিকে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হয়েছে সাধারণ ক্রেতারা। কোনটায় ভ্যাট আছে আর কোনটায় নেই তা জানার কোনো সুব্যবস্থা না থাকায় বিভিন্ন পণ্য বিক্রেতারা ভ্যাটের অজুহাতে ইচ্ছেমতো জিনিসিপত্রের বাড়তি দাম রেখে মুনাফা লুটেছে। সরকার চুপচাপ দর্শক থেকেছে। তখনই বিভিন্ন মহল থেকে বলা হয়েছিল, রাজস্ব প্রশাসন সংস্কার ও আধুনিকায়ন না করলে এই সুফল খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারবে না। পর্যায়ক্রমে বিষয়টি সহনীয় হয়ে এলেও এখন পর্যন্ত কোনো সরকারই রাজস্ব প্রশাসনকে দক্ষ ও আধুনিক করে তোলার জন্য যথাযথ সংস্কার করেনি বা করার কোনো চেষ্টা নেয়নি। ফলে কর প্রশাসনে দুর্নীতি ও অদক্ষতা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে করদাতাদের হয়রানি। একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী চুক্তিভিত্তিক ঘুষ ও উপরির ব্যবস্থা করে সাধারণ ও সৎ আয়করদাতাদের ফেলেছে বিপাকে। কর প্রশাসন করদাতা বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে উৎকোচের বিনিময়ে ছাড় দিয়ে চেপে ধরেছে ছোট ও মাঝারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোকে। এদের মধ্যে যারা আপসরফা করতে পেরেছে, তারা পার পেলেও বাকিরা বিপাকে পড়েছে। এমনিতেই কর কর্মকর্তাদের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে কর নির্ধারণ ও রিটার্ন গ্রহণ করার বিষয়ে। কর আদায়ের জন্য এসব ক্ষমতার প্রয়োজন থাকলেও বাংলাদেশে এর অপপ্রয়োগ এতো বেশি যে, কম-বেশি সবাই এতে বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত। এসব সংস্কার না করে এবার ভ্যাট কর্মকর্তাদের হাতে গ্রেপ্তারি ক্ষমতা তুলে দিয়ে অর্থমন্ত্রী রাজস্ব প্রশাসনের দুর্নীতি ও এ থেকে সৃষ্ট হয়রানিকে চরমে তোলার ব্যবস্থা করেছেন। ধ্বংস হবে ছোটখাটো দেশী এন্টারপ্রেনর।

গ্রেপ্তারের ক্ষমতা পেয়ে এই ভ্যাট কর্মকর্তারা কি করবেন, তা নিয়ে বিশেষ করে খুচরা ও সাধারণ ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। এমনকি বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শনের নামে আয়কর কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কম-বেশি হয়রানি হতে হয়েছে তাদেরকে। এবার সেই হয়রানির মাত্রা আরো বাড়তে যাচ্ছে। হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য অনেকেই বাধ্য হবে ঘুষের পরিমাণ বাড়াতে। ঘুষ বাড়া মানে সরকারের প্রকৃত রাজস্ব আদায় কমে যাওয়া। একজনের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা ঘুষ খেয়ে ভ্যাট কর্মকর্তা প্রকৃত ভ্যাট ২০ হাজার টাকা হলে তা কমিয়ে করে দেবেন তিন হাজার টাকা। সরকারি কোষাগার বঞ্চিত হবে ১৭ হাজার টাকার রাজস্ব থেকে। অর্থমন্ত্রীর রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা কার্যত ব্যর্থ হবে। হ্যাঁ, হয়তো গ্রেপ্তারের ভয়ে অতীতে যারা ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছে তাদের অনেকেই এবার নিবন্ধিত হবে, যা মোট আদায়কে খানিকটা বাড়াবে। কিন্তু সেটা না হবে টেকসই, না হবে সন্তোষজনক। ছোট ও সাধারণ ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে রাজপথে নেমে এসেছেন ভ্যাট কর্মকর্তাদের এই ক্ষমতা দেয়ার প্রতিবাদে। তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ভ্যাট দিতে গিয়ে মান-সম্মান খোয়াতে তারা রাজি নন।

ঢাকা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ভ্যাট আদায়ে সহকারী কমিশনারের ক্ষমতা বাড়ালে এর অপব্যবহার হবে। এতে ব্যবসায়ীরা হয়রানির শিকার হবেন। আমরা সরকারি পাওনা দিতে রাজি কিন্তু ভ্যাট আদায়ের নামে গ্রেপ্তার করা হলে ব্যবসায়ীদের সম্মান কোথায় যাবে?'

চ্যালেঞ্জের মুখে পোশাক শিল্প

বদরুল আলম নাবিল

দেশীয় কাপড়, দেশীয় ডিজাইনার, দেশীয় কারিগর এবং দেশীয় বুনন শিল্পীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় আমাদের বুটিক শিল্প এক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছেছে। নানা সীমাবদ্ধতা, পুঁজির অভাব এবং সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও এই শিল্প ডিজাইন, রুচি, বুনন এবং বৈচিত্র্যে বাঙালির ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরছে। এই শিল্পের মানুষদের গত তিন দশকের চেষ্টায় এটি এখন আলাদা শিল্প হিসেবে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৭-৮ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এখানে। এই শিল্পের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যারা স্টাডি করছেন তাদের মতে, এভাবে এগুতে থাকলে আগামী দশ বছরে আরো ৮-১০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে।

এমন একটি দেশীয় শিল্পের বিকাশ-সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য সরকার বিশেষ নজর দেবে এটা প্রত্যাশিত। কিন্তু কোনো কালেই সরকারের তরফ থেকে সে রকম সহায়তা পায়নি। বরং সরকারের ক্রম উদার আমদানি নীতির ফলে এই শিল্প কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে।

আমাদের টেক্সটাইল শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য কাপড় আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তৈরি পোশাক আমদানি বৈধ! অন্যদিকে দেশীয় পোশাক প্রস্তুতকারীদের ২.৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হয়, আমদানিকৃত পণ্যে একই হারে ভ্যাট দিতে হয়। ফলে দেশীয় বুটিক শিল্প পড়েছে এক অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে। সরকার পক্ষের সহযোগিতায় পার্শ্ববর্তী দেশের মাড়ওয়ারি ব্যবসায়ীরা আমাদের বুটিক শিল্পকে ধ্বংস করে তাদের একচ্ছত্র মার্কেট তৈরি করার জন্য এ দেশে তাদের নিম্নমানের অথচ চোখধাঁধানো পোশাক এনে ডাম্প করছে। এ ক্ষেত্রে তারা দেশীয় কিছু ব্যবসায়ীকে বাকিতে মাল সরবরাহ করে। কখনো কখনো তাদের মল/সুপার মার্কেট নির্মাণের জন্য টাকা দিয়ে বাজার ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে গ্রামীণ চেকের বিপরীতে মাদ্রাজ চেক বাজারে ডাম্পিং করার যে চেষ্টা হয়েছিল ঐসব মাড়ওয়ারি ব্যবসায়ীদের। পুঁজি বহুগুণ বেশি, যাদের সঙ্গে আমাদের ছোট ও মাঝারি পুঁজি পেরে উঠবে না কখনোই। তার ওপর এই ভ্যাট সন্ত্রাস।

অভিযোগ রয়েছে, কাস্টমসে 'মিস ডিক্লারেশন' ও 'আন্ডার ইনভয়েস' করে প্রচুর ফেব্রিক বাইরে থেকে আনা হয় রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। এসব ফেব্রিকের অনেকটাই চোরাইপথে বাজারে বিক্রি করে দেয়া হয়। যার

বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আমির হোসেন বলেন, 'ভ্যাট প্যাকেজের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক নির্ধারণ করা উচিত। কোনো রকম হিসেব নিকেশের মাধ্যমে ভ্যাট নির্ধারণের ব্যবস্থা থাকলে সেখানে দুর্নীতি হবে, ব্যবসায়ীরা হয়রানির মধ্যে পড়বে?'

অবশ্য এর বিপরীত বক্তব্যও আছে ব্যবসায়ীদের তরফে। ঢাকার ইস্টার্ণ প্লাজা দোকান মালিক কো-অপারেটিভ সোসাইটির জয়েন্ট সেক্রেটারি শাহীন মিয়াজি ২০০০কে বলেন, 'আমরা এই আন্দোলনের সঙ্গে নেই। ইস্টার্ণ প্লাজার দোকান মালিকরা ২০০১ সাল থেকে মাসে ৩০০ টাকা করে ভ্যাট দিয়ে আসছি। ভ্যাট দিলে গ্রেপ্তারের প্রশ্ন আসে না।'

ইস্টার্ণ প্লাজা দোকান মালিক সমিতির সেক্রেটারি ফকরুল ইসলাম (মিন্টু) ২০০০কে বলেন, 'প্রথমেই এ রকম হার্ড লাইনে না গেলেও সরকার পারতো। ভ্যাট দেয়ার অভ্যাস ব্যবসায়ীদের নেই। ভ্যাট দেয়ার কালচার গড়ে উঠতে সময় লাগে'। তিনি বলেন, 'গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন কি, সরকার আইন করতে পারে আয় কর সার্টিফিকেটের মতো ভ্যাট সার্টিফিকেট না থাকলে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন, ব্যাংক একাউন্ট বা বিজনেস পাসপোর্ট করা যাবে না। এতে ব্যবসায়ীরা নিজের প্রয়োজনেই ভ্যাট দেবে।'

ইস্টার্ণ প্লাজার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দোকান মালিক ২০০০কে জানিয়েছেন তিনি রাজস্ব বোর্ডের ধানমন্ডি জোনের অফিসে গিয়েছিলেন ভ্যাট দেয়ার নিবন্ধন করার উদ্দেশ্যে। অফিসে বোর্ডে লেখা আছে বিনামূল্যে ভ্যাট নিবন্ধন করা হয়। কাউকে কোনো টাকা দেবেন না।

ঠিক তার পাশেই অফিসের নিবন্ধনের জন্য ২ হাজার টাকা দাবি করে। শুধু একজন ব্যবসায়ী নয়, আমরা প্রায় ২০ জন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলেছি। এর মধ্যে এমন কাউকে পাইনি যিনি ভ্যাট দেয়ার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন করতে গেছেন কিন্তু তার কাছে ১ থেকে ৩ হাজার টাকা ঘুষ চায়নি।

ভিকারুন নিসা স্কুলের এক শিক্ষিকা জানালেন তাদের আয়করের আওতায় আনা হয়েছে। তিনি কাওরান বাজারস্থ রাজস্ব অফিসে গিয়েছেন নিবন্ধন করার জন্য। তার কাছে দেড় হাজার টাকা দাবি করেন এ অফিসের কর্মকর্তা। শিক্ষিকা আরো জানালেন, শুধু তিনি একা নয়, তার সকল সহকর্মীই দাবিকৃত ঘুষ দেয়ার পরেই কেবল আয়কর দাতা হিসেবে নিবন্ধ করতে পেরেছেন। শুধু টাকা দিয়েই শেষ নয়, আছে আরো নানা রকম হয়রানি, সময় ক্ষেপণ। এ রকম ভোগান্তি হলে মানুষ ট্যাক্স/ভ্যাট দিতে উৎসাহী হবে কেন? টাকা দেব আবার ভোগান্তিও পোহাতে হবে!

ভ্যাট কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারি ক্ষমতা দেয়ার প্রতিবাদে গত ৭ জুলাই রাজপথে নেমে এসেছিলেন ঢাকার বিভিন্ন এলাকার প্রায় ২ লাখ ছোট ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ী-বিক্রেতারা।

এফবিসিসিআইর সাবেক পরিচালক এ রউফ চৌধুরী বলেন, 'ভ্যাট কর্মকর্তাদের হাতে গ্রেপ্তারি ক্ষমতা তুলে দেওয়া একটি মারাত্মক পদক্ষেপ। এতে হয়রানি ও দুর্নীতি বাড়বে, ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।'

১৯৯০-৯১ অর্থবছরে সরকারের মোট রাজস্ব আয় ছিল ৭ হাজার ৮২২ কোটি টাকা। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এসে এই রাজস্ব আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা

ব্যাপারটা আসলেই তাই। সহকারী কমিশনাররা গ্রেপ্তারি ক্ষমতা পেয়ে এখন আরো উদ্ধত ও প্রতাপশালী হয়ে উঠবেন। হয়ে উঠবেন স্বেচ্ছাচারী। আর তাদের এই ক্ষমতার দাপট যাবে মূলত ছোট ও সাধারণ ব্যবসায়ী-বিক্রেতাদের ওপর দিয়ে। অর্থমন্ত্রী কী বলতে পারবেন, ভ্যাট ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে কি না তা অনুসন্ধানের জন্য সহকারী কমিশনাররা প্রতিষ্ঠিত ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নির্দ্বিধায় যাবেন এবং ফাঁকি প্রমাণিত হলে তাদেরও গ্রেপ্তার করা হবে? পারবেন না। কারণ, ঐসব জায়গায় যাওয়ার সাহস এসব কর্মকর্তার নেই। বরং ঐসব জায়গার অনেকগুলোই সংরক্ষিত কিছু মন্ত্রী, এমপি ও উঁচু পর্যায়ের আমলাদের জন্য। আর তাই ব্যাপারটা উল্টো করে দেখলে আমরা বোধহয় এভাবেও বলতে পারি যে, ঐসব জায়গায় যেতে পারবে না বলেই ছোট কর্মকর্তাদের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে এই গ্রেপ্তারি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যেন তারা নিজেরা নিজেদেরটা জোগাড়-যন্ত্র করে নেয়। করের ফলে দেশীয় কাপড় ও ফেব্রিক মার খাচ্ছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) দাবি করছে যে বিদ্যমান বন্ডেড ওয়্যারহাউজগুলো থেকে এসব ফেব্রিক খোলা বাজারে চলে আসছে। তারা আরো আশঙ্কা করছে সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ স্থাপন করা হলে এই কাপড় পাচার আরো বাড়বে।

বুটিক হাউজ কে-ক্রাফটের প্রধান খালিদ মাহমুদ খান ২০০০কে বলেন, 'আমরা সরকারের সুদৃষ্টি পেলে আরো অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারতাম। দেশের অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানে ভালো অবদান রাখতে পারতাম। আমাদের মতো ছোট বা মাঝারি ধরনের শিল্পকে ব্যাংক ঋণ দিতে চায় না। দিলেও চড়া সুদ নেয়। চলতি বাজেটে ছোট ও মাঝারি শিল্পকে স্বল্পসুদে ঋণ দেয়ার প্রস্তাব রেখেছে। যেসব ব্যাংক এ ধরনের ঋণ দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের আবার ৫ শতাংশ সুদে টাকা দেবে।

কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং এই ঋণ গ্রহণে অনেক পেপার ওয়ার্ক করতে হয় বলে ব্যাংকগুলো এ ধরনের ঋণ দিতে উৎসাহী হচ্ছে না। এই ঋণ প্রদান প্রক্রিয়াটা সহজ করা জরুরি। খালিদ মাহমুদ খান আরো বলেন, 'ভ্যাট আদায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির ক্ষমতা যে দেয়া হয়েছে এটার অপব্যবহার হবে। কারণ সরকারের যে সংস্থা ভ্যাট/ট্যাক্স আদায় করে তাদের ম্যানেজমেন্ট আধুনিক নয়, তার লোকবল প্রশিক্ষিত নয় এবং তারা সৎ নয়। ফলে এটা ব্যবসায়ীদের হয়রানি বাড়াবে এবং কর্মকর্তাদের অসৎ আয়ের সুযোগ সম্প্রসারিতও করবে। যেমন আমাদের একটি শপে ভ্যাট কালেক্টররা এসে বলল, ৫০ হাজার টাকা ভ্যাট দিতে হবে। কিন্তু এ শপে যা বিক্রি তাতে ভ্যাট ৫ হাজারের বেশি হওয়ার কথা নয়। যারা এই অযৌক্তিক দাবি করে তাদের হাতে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেয়া হলে কি হবে বুঝতে পারছেন! দেশীয় শিল্পকে সুবিধা দেয়ার জন্য কনস্যুলেটেড (নির্দিষ্ট অঙ্ক) ভ্যাট সুবিধা দিতে পারে এবং আমদানিকৃত পণ্যে রেগুলার সেলের ওপর ভ্যাট ধার্য করা যেতে পারে।'

বুটিক হাউজ বাংলার মেলার প্রধান নির্বাহী এমদাদ হক ২০০০কে বলেন, 'আমাদের দেশে যেহেতু ভ্যাট-ট্যাক্স দেয়ার ব্যাপারে সে রকম জনসচেতনতা নেই তাই সরকারের উচিত, এ ব্যাপারে এখনই এতো কড়াকড়ি না করে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য ক্যাম্পেইন করা। আমরা পলিথিনের ক্ষেত্রে দেখেছি, ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ভালো ফল পাওয়া গেছে। আর ভ্যাট-ট্যাক্স প্রদান প্রক্রিয়া সহজ এবং আধুনিক করতে হবে, যাতে এসব দিতে গিয়ে মানুষ হয়রানির মধ্যে না পড়ে। উৎকোচ নেয়া কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে'।

আর একজন ফ্যাশন হাউজের প্রধান বলেন, আমার ছোট সংস্থা, যা আয় তাতে আমার বেতনই হয় বলতে পারেন। কিন্তু এর ওপর নির্ভরশীল পুরোপুরিভাবে ৩০টি পরিবার। আমাদের ট্যাক্সের বাইরে রাখাই উচিত। এখন তো দোকান বন্ধের কথা ভাবছি। ভারতীয় থ্রি পিসে বাজার ভরে দেয়া হয়েছে। এগুলো এসেছে কাঁচামাল হিসেবে। কে সুযোগটা দিচ্ছে? এই যারা আমাদের গ্রেপ্তার করবেন তারাই।

দায় দায়িত্ব উঁচু পর্যায়ে থেকে গেলো।

ছোট হোক, বড় হোক সব ব্যবসায়ীকে এখন ব্যবসা করতে হলে চাঁদা দিতে হয় দুই ধরনের সন্ত্রাসীকে। একটি হলো মাস্তান-চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী, আরেকটি হলো আইনের পোশাক পরিহিতি পুলিশরূপী সন্ত্রাসী। এদের সঙ্গে এবার যুক্ত হতে চলেছে ভ্যাট আদায়কারী সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসের তৃতীয় ধারা। রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা ও আর্থিক প্রণোদনা বাড়ানোর কোনো ব্যবস্থা না করে এভাবে সরাসরি চাঁদাবাজি-সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে উৎসাহিত করার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কোনোভাবে গ্রহণীয় হতে পারে না। এর ফলে VAT এখন Value Added Tax না থেকে হয়ে যাবে Violence Added Tax.

অর্থমন্ত্রী অনেক সময় অভিযোগ করে থাকেন, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার লোকজন আয় করলেও কর দিতে চান না, ভ্যাট ফাঁকি দেন। তাঁর এই অভিযোগ সত্যি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন লোকজন কর ফাঁকি দিতে চায় তা কি তিনি কখনো খতিয়ে দেখেছেন? যে দেশে ন্যায়সঙ্গতভাবে কর দিতে গেলে হয়রানির শিকার হতে হয় আর ঘুষ দিয়ে অবৈধভাবে কাজ আদায় করে কর ফাঁকি দিলে বাহবা মেলে, সে দেশে লোকজন কেন কর দেবে? আবার ঘুষ সাধলেই নিতে হবে কেন? সরকার নিজের লোকজনের বেতন-ভাতা আর সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে সম্মানজনক পর্যায়ে নিলে এবং প্রশাসনে জবাবদিহিতার সুব্যবস্থা করলে ঘুষ-দুর্নীতি কমবে বৈ বাড়বে না। তাছাড়া কর দেয়ার ক্ষেত্রে করদাতারা সহযোগিতা করতে চেয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। বিভিন্ন বিপণি বিতানে ও সুপার মার্কেটে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে কর কর্মকর্তারা স্পট অ্যাসেসমেন্ট করে অনেককে করের আওতায় এনেছে। এভাবে ভ্যাটের আদায়ও বেড়েছে। এই সহযোগিতার নীতি থেকে সরে এসে এখন ভ্যাট কর্মকর্তাদের সন্ত্রাসী বানানোর এই সাইফুরীয় প্রয়াস কেন? ভ্যাট আদায় বাড়ানোর জন্য দুই বছর আগে চিকিৎসক ও আইনজীবীদের ভ্যাটের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই দুই পেশাজীবীদের প্রবল চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত অর্থমন্ত্রী পিছু হটেন। আজ পর্যন্ত এদের ভ্যাটের আওতায় আনা যায়নি। সমাজের প্রভাবশালী অংশের স্বার্থের চাপ কেন সাধারণ মানুষের ওপর পড়বে? চিকিৎসক ও আইনজীবীদের আয়কর পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন ছিল। এতে দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব পড়তো না। কিন্তু ভ্যাট সন্ত্রাসে ছোটখাটো প্রডিউসাররা ধ্বংস হলে দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজবে।

অর্থমন্ত্রী ভ্যাট আদায়ে এতো মরিয়া কেন হয়ে উঠেছেন তা বুঝতে হলে এবারের বাজেটের আরেকটি দিক পর্যালোচনা করতে হবে। বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ গত বছরই সরকারকে শর্ত দিয়েছিল যে, সর্বোচ্চ শুল্ক হার থাকবে ৩০%

৩.

এক যুগের ব্যবধানে বাংলাদেশে রাজস্ব আয় বেড়েছে প্রায় পাঁচগুণ। কিন্তু পাঁচগুণ পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে পারলেও বাংলাদেশের জিডিপিতে মোট রাজস্বের অংশ এই সময়ে বেড়েছে সামান্যই। ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে সরকারের মোট রাজস্ব আয় ছিল ৭ হাজার ৮২২ কোটি টাকা। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এসে এই রাজস্ব আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা। অথচ এখনও বাংলাদেশের রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত ১০%-এর কোটা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি, যা স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানের হিসাবেও কম। ২০০২-০৩ অর্থবছরে এর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ১০.৬% আর বাস্তবে হয়েছে ১০.৩৫%। প্রাথমিক হিসাব অনুসারে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ১০.৯%-এ। অন্যদিকে আইপিআরএসপি দলিলে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এসে এই হার ১২.৩%-এ উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। প্রতি বছর রাজস্ব আয় বাড়ছে ঠিকই কিন্তু জিডিপির পরিমাণও তো বাড়ছে। জিডিপি যে হারে বাড়ছে তার চেয়ে বেশি হারে রাজস্ব না বাড়লে কখনোই রাজস্ব কার্যক্রমে দক্ষতা আনা সম্ভব নয়। এর মানে হলো পরিমাণগতভাবে রাজস্ব আয় বাড়লেও আসলে তা জিডিপির হিসাবে অর্থনীতির জন্য যথেষ্ট হয়ে ওঠেনি সরকারের রাজস্ব কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতা ও দুর্নীতির কারণে। রাজস্ব আয়ের এই নিম্নহারের ফলে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে এখনও বিদেশী অর্থায়ন নির্ভরতা অনেকখানি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ৪৫% ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে বিদেশী বা বহিঃস্থ উৎস থেকে। জিডিপিতে রাজস্ব আয়ের অংশ না বাড়লে বা বলা যায় রাজস্ব আদায় ও ব্যবহারে দক্ষতা বাড়াতে না পারলে এই পরিস্থিতি থেকে সহসা উত্তরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বলাই বাহুল্য, সরকারের কর্মকান্ডে সেই সৎ প্রচেষ্টার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

রাজস্ব খাতের স্বচ্ছতা ও সরকারি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি 'সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন' গঠনের জোর দাবি উঠেছিল বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে। বিষয়টির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ২০০২ সালের জুন মাসে 'সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন' গঠন করা হয়। এর কাজ ধার্য করা হয়: সরকারি ব্যয়ের সিদ্ধান্ত, বাজেট তৈরি প্রক্রিয়া উন্নতকরণ, সমন্বিতকরণ ও বাস্তবায়ন, বিভিন্ন সুবিধাভোগীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছ ও

উন্নতমানের বাজেট প্রক্রিয়ার প্রবর্তন, কার্যকর নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও যৌক্তিকীকরণ প্রভৃতি বিষয় পর্যালোচনা করা। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট উভয় ক্ষেত্রেই সরকারি ব্যয় যৌক্তিকীকরণ বিষয়টিও কমিশনকে দেখতে বলা হয়। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে কমিশন অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন দাখিল করে। আর ২০০৩ সালের মাঝামাঝিতে দাখিল করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন। কমিশনের সুপারিশের আলোকে পরিকল্পনা কমিশন বিস্তারিত কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছে বলে জানা গেলেও এর প্রতিফলন এখনও সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। বিশেষ করে কর প্রশাসনকে সংস্কারের যে সুপারিশ করা হয়েছিল সেগুলো নিয়ে তেমন কাজ হচ্ছে না। একইভাবে রাজস্ব আদায় পদ্ধতি উন্নততর করার এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ বাড়ানোর বিভিন্ন উপায় নির্ধারণ করতে ২০০২ সালে জুন মাসে রাজস্ব বিষয়ক একটি কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন এর প্রতিবেদন দাখিল করলেও এর বাস্তবায়ন কতোখানি এগিয়েছে তা অস্পষ্ট। সরকার বরং ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত উপায়ে প্রকল্পভিত্তিক কাজ নিয়ে যেখানে কনসালটেন্টদের পেছনে লাখ লাখ টাকা ঢালা হচ্ছে অথচ কর প্রশাসন শক্তিশালী করায় নেই কোনো কার্যকর উদ্যোগ। আর তা নেই বলেই সদ্য সমাপ্ত অর্থ বছরে এনবিআর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। ২৭,৭৫০ কোটি টাকায় লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে নামানো হয়েছিল ২৭,০৫০ কোটি টাকা। তারপরও আদায় হয়েছে ১,৭২১ কোটি টাকা কম। এর মধ্যে শুধু আয়করই কম আদায় হয়েছে ১৭৫ কোটি টাকা।

যেই ভ্যাট নিয়ে এতো হৈ চৈ সাম্প্রতিককালের সেই ভ্যাট আদায়ের প্রবণতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয়ের ভ্যাটের অংশ কমে গেছে। এটি কমেছে মূলত আমদানিখাতে ভ্যাট কমে যাওয়ায়, যখন আমদানি প্রবৃদ্ধি ছিল নেতিবাচক। এর বিপরীতে স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাট বেড়েছে। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয়ে ভ্যাটের অংশ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে মূলত স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাটের আওতা বাড়ানোর কারণে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে স্থানীয় পর্যায়ে ভ্যাটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও আমদানি পর্যায়ে ঘাটতি দেখা দিয়েছে ২৮৭ কোটি ২৫ লাখ টাকা। এবং দেশের সাতটি ভ্যাট আদায়কারী সংস্থার মধ্যে শুধু চট্টগ্রাম কালেক্টরেট অর্জন করেছে। মজার বিষয় হলো, এখন পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে সেই ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ২১.৭% হারে। ভ্যাট প্রবর্তনের ফলে ঐ অর্থবছর রাজস্ব আদায়ে এই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়।

৪.

অর্থমন্ত্রী ভ্যাট আদায়ে এতো মরিয়া কেন হয়ে উঠেছেন তা বুঝতে হলে এবারের বাজেটের আরেকটি দিক পর্যালোচনা করতে হবে। বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ গত বছরই সরকারকে শর্ত দিয়েছিল যে, আমদানি শুল্ক কাঠামো প্রচলিত চার স্তর থেকে তিন স্তরে নামিয়ে আনতে হবে এবং সর্বোচ্চ শুল্ক হার থাকবে ৩০%। দাতাগোষ্ঠীর প্রতি অনুগত সাইফুর রহমান দাতাভক্তিতে এতোই আকুল যে শুল্ক স্তর তিনটিতে নামিয়ে আনলেও সর্বোচ্চ শুল্ক হার করেছেন ২৫%। অথচ সবনিম্ন হার রেখেছেন ৭.৫%। তার মানে হলো, কাঁচামাল আমদানি করতে হলে অন্তত ৭.৫% হারে শুল্ক দিতে হবে। আর তৈরি পণ্য আমদানিতে শুল্ক দিতে হবে সর্বোচ্চ ২৫%। অথচ কাঁচামাল আমদানি করা হয়ে থাকে দেশে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন পণ্যের জন্য। কাঁচামাল আমদানি ব্যয় বাড়লে যেমন এসব পণ্যের দাম বেড়ে যায়, তেমনি আবার সমজাতীয় প্রস্তুতকৃত দ্রব্য কম দামে বা কম শুল্কে আমদানি করা হলে দেশের বাজারে দেশীয় দ্রব্যের জন্য প্রতিযোগিতা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

সরকারের কোষাগারে অর্থ জোগান থাকলেই অর্থনীতিকে সবল বলেন সাইফুর রহমান। এটা একাউন্টেন্ট ক্যাশিয়ারের ভাবনা। ইকনমিস্টরা বলেন দেশে এন্টারপ্রেইনর তৈরি করতে হবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে থেকে

এবারের বাজেটের এই দাতাপ্রীতির ফলে দেশীয় শিল্প বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ধ্বংস করার সর্বাত্মক পদক্ষেপই নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৭ হাজার বিভিন্ন ধরনের পণ্য-সামগ্রী আমদানি করা হয়। যার মধ্যে কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য ও প্রস্তুতকৃত পণ্য সবই অন্তর্ভুক্ত। নতুন শুল্ক কাঠামোর নতুন অর্থবছর থেকে এর আওতায় প্রায় ১৫০০ পণ্য কাঁচামাল হিসেবে ৭.৫% আমদানি শুল্ক দিয়ে আনা যাবে যেখানে আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ১৪৩০। এর বিপরীতে প্রায় ২,৮৯০টি প্রস্তুতকৃত পণ্য আমদানি করা যাবে মাত্র ২৫% আমদানি শুল্ক দিয়ে, যেখানে গত বছর পর্যন্ত ২৪০০ পণ্য আমদানি করা গেছে ৩০% শুল্ক দিয়ে। এই ৫% কমালো কার স্বার্থে? সবচেয়ে লাভবান হবে ভারত।

শুল্ক হারের এই পুনর্বিন্যাসের মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাবটি হলো বিনিয়োগ বাড়বে কেনা-বেচার ব্যবসায়, বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করে দেশের বাজারে বিক্রির ব্যবসায়। এমনিতেই আমাদের এখানে শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ কম। তাও যেসব নতুন শিল্প দাঁড়াচ্ছিল, সেগুলোর কোমর ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বাজেটে। পোলট্রি শিল্পের কথাই ধরা যাক। লোক দেখানোভাবে পোলট্রি শিল্পকে উৎসাহিত করতে এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশের শুল্ক হ্রাস করে দেয়া হলেও একই সঙ্গে বিদেশ থেকে ব্রয়লার মুরগির মাংস আমদানির ওপর থেকে শুল্ক তুলে নেয়া হয়েছে। ফলে, দোকানদারি বাড়বে, দোকানি-ব্যবসায়ী বাড়বে, বাড়বে না শিল্প উদ্যোগ। আর শিল্প না বাড়লে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে না। ফলে বেকারত্ব বেড়ে গিয়ে সামাজিক অস্থিরতা আরো বাড়বে, আরো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। আবার দোকানিরাও যে শান্তিমতো ব্যবসা করতে পারবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ, বাজেটে ভ্যাট সন্ত্রাসী সৃষ্টির যাবতীয় ব্যবস্থাই করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এর ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই দাম বাড়ার চাপ এসে পড়বে সাধারণ মানুষের ওপর। মূল্যস্ফীতির হার এমনিতেই ৬% ছুঁই ছুঁই করছে। জনজীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সরকার সবকিছু বাজারের ওপর ছেড়ে দিচ্ছে। ফলে বাজারে চিনি, পেঁয়াজসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করছে কয়েকটি চক্র। এসব দুষ্টচক্র নিয়ন্ত্রণ না করে ভ্যাট সন্ত্রাস তৈরির অপচেষ্টা কেন?

শুল্কহার হ্রাসের এই পদক্ষেপের ফলে সরকার ৭৭৫ কোটি রাজস্ব লোকসান করবে বলেও বাজেটে বলা হয়েছে। আর সেই লোকসান পোষানোর বিকল্প খুঁজতেই কী ভ্যাট আদায়ের জন্য সহকারী কমিশনারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে গ্রেপ্তারি ক্ষমতা? এ ধরনের বাস্তবতা বিবর্জিত পদক্ষেপ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু অদক্ষ আর দুর্নীতিপরায়ণই করবে না, একই সঙ্গে এগুলোর ওপর থেকে জনগণের ন্যূনতম আস্থাটুকুও খোয়া যাবে।

সরকারের কোষাগারে অর্থ জোগান থাকলেই অর্থনীতিকে সবল বলেন সাইফুর রহমান। এটা একাউন্টেন্ট ক্যাশিয়ারের ভাবনা। ইকনমিস্টরা বলেন দেশে এন্টারপ্রেইনর তৈরি করতে হবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে থেকে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে দেশের শিল্প ধ্বংস করে আমদানি বাড়িয়ে সরকারি কোষাগার ঠিক রাখা হবে।

এটা চলতে পারে না। ট্যাক্সের ভায়োলেন্স বন্ধের দাবি করছি।